স্নাতক

বাংলা ছোটগল্প

বাংলা অনার্স-এর ছাত্রছাত্রীদের জন্য নতুন সিলেবাসের পাঠ্য-তালিকাভুক্ত গল্প-সংকলন

সংকলন, সম্পাদনা ও গল্প-বিশ্লেষণ

ড. বিজিত ঘোষ

এম এ (প্রথম শ্রেণীতে প্রথম, স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত, ক.বি.);
এম ফিল (প্রথম শ্রেণী); পি এইচ ডি (ক.বি.)
অধ্যাপক, শ্রীরামপুর কলেজ, হুগলী

গ্রন্থতীর্থ

GRANTHA TIRTHA CALCUTTA

প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা

৬৫/৩এ, কলেজস্ট্রিট, কলকাতা–৭০০ ০৭৩

সূচিপত্র

ভূমিকা			১১
গল্পকার		**গল্প**	**পৃষ্ঠা**
ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়	ঃ	স্বদেশি কোম্পানি	৪৭
স্বর্ণকুমারী দেবী	ঃ	কেন?	৫৬
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ঃ	দেনাপাওনা	৬২
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	ঃ	বলবান জামাতা	৭০
		আদরিণী	৮১
		দেবী	৯১
পরশুরাম	ঃ	লম্বকর্ণ	১০৬
		বিরিঞ্চিবাবা	১৩১
জগদীশ গুপ্ত	ঃ	"পয়োমুখম্"	১৭৩
		দিবসের শেষে	১৯৭
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	ঃ	মেঘমল্লার	২০৩
		পুঁইমাচা	২২৬
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	ঃ	জলসাঘর	২৪৮
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	ঃ	চুয়াচন্দন	২৮৭
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	ঃ	সারেঙ	৩৩৩
প্রেমেন্দ্র মিত্র	ঃ	মহানগর	৩৪৪
		স্টোভ	৩৬৯
		তেলেনাপোতা আবিষ্কার	৩৭৮
প্রবোধকুমার সান্যাল	ঃ	অঙ্গার	৩৯০
সতীনাথ ভাদুড়ী	ঃ	চরণদাস এম. এল. এ.	৪১৯
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	ঃ	প্রাগৈতিহাসিক	৪৩৯
		হারাণের নাতজামাই	৪৫৩
আশাপূর্ণা দেবী	ঃ	ছিন্নমস্তা	৪৬৮
সুবোধ ঘোষ	ঃ	ফসিল	৪৭৯
		চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ	৫০৫
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	ঃ	চোর	৫১৯
কমলকুমার মজুমদার	ঃ	মতিলাল পাদরী	৫৪৫

গল্পকার		গল্প	পৃষ্ঠা
নরেন্দ্রনাথ মিত্র	ঃ	অবতরণিকা	৫৬৯
		চড়াই-উৎরাই	৬০১
		পালঙ্ক	৬১৭
সাবিত্রী রায়	ঃ	অন্তঃসলিলা	৬৫৪
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	ঃ	টোপ	৬৬৫
		রেকর্ড	৬৮২
বিমল কর	ঃ	নিষাদ	৬৯০
ফণীশ্বরনাথ রেণু	ঃ	দাহ	৭০৩
সমরেশ বসু	ঃ	আদাব	৭১৮
		কিমলিস্	৭৩০
মহাশ্বেতা দেবী	ঃ	সাঁঝ-সকালের মা	৭৫০
দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	ঃ	অশ্বমেধের ঘোড়া	৭৮১
তপোবিজয় ঘোষ	ঃ	এখন প্রেম	৭৯৭
সাধন চট্টোপাধ্যায়	ঃ	স্টিলের চঞ্চু	৮১০

ভূমিকা

সবকিছুরই সূচনারও আগে একটা সূচনা থাকে। রবীন্দ্রনাথ যে-ব্যাপারটাকে বলতেন, 'প্রদীপ জ্বালানোর আগে সলতে পাকানো।'

বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ছোটগল্পের প্রদীপটি জ্বলার আগেও তার সলতে পাকানোর কাজ করে গেছেন অনেকেই। বিশেষ করে, রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিম সহোদর পূর্ণচন্দ্র ও সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ; ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, জলধর সেন এবং অতি অবশ্যই স্বর্ণকুমারী দেবী প্রমুখ ছোটগল্প লেখার চেষ্টা করে গেছেন। সেসব চেষ্টা ছোটগল্পের যথাযথ শিল্পরূপ না পেলেও, গল্প হিসেবে এঁদের সৃষ্টি অবশ্যই স্মরণযোগ্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রথম গল্পটি (**ভিখারিণী**—১২৮৪) তো নয় ; তারপর লেখা তিনটি গল্পও (**ঘাটের কথা**—১৮৮৪, **রাজপথের কথা**—১৮৮৪, **মুকুট**—১৮৮৫) ছোটগল্পের যথার্থ সার্থকতায় পৌঁছোতে পারেনি। আবার সেই রবীন্দ্রনাথেরই লেখা পঞ্চম গল্পটি কেবল তাঁরই প্রথম সার্থক ছোটগল্প নয় ; বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসের ধারাতেও সেটিই (**'দেনাপাওনা'**—১৮৯১) প্রথম সার্থক ছোটগল্প।

গল্প : গল্প আমাদের বড়ো আদরের জিনিস্। গর্বের ধন। সে কী আজকের কথা! মানবজন্ম থেকেই গল্পেরও জন্ম। মানুষ কথা বলতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই শিখেছে গল্প বলতে পারাও। গল্প শব্দটি এসেছে 'জল্প' বা 'জল্পন' বা 'জল্পনা' থেকে। আর জল্পনা হল মানুষের কথাবার্তা। এর মধ্যে আমরা সহজেই মানুষের কল্পনা-প্রবণ মনের সন্ধান করতে পারি। আসলে মানুষ তার অভিজ্ঞতার কাহিনি বলতে গিয়ে তাকে কল্পনার নানা রঙে রাঙিয়ে মনোহারী করে তুলত। গল্প বলার প্রবণতা মানুষের আদিম বৃত্তিগুলির মধ্যে একটি। মানুষের ইতিহাসের মতোই সুপ্রাচীন গল্প বলার ইতিহাস। যাযাবর মানুষের মনে একদিন প্রথম দেখা দিয়েছিল কথার অঙ্কুর। সেই কথাকে তারা প্রথম রূপ দিয়েছিল ভাষার মধ্যে। মানুষে গল্প বলার/শোনার আকাঙ্ক্ষা সেই আদিমকালের।

গল্পের উৎস : গল্পের উৎসের কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় পুরাকাহিনী। রূপকথা আর, উপকথার কথা। হোমারকে বলা হয় প্রতীচ্য গল্প-সাহিত্যের পথ-নির্দেশক। এছাড়া তো আছেই আমাদের ভারতীয় সাহিত্যের গল্প। সেসব গল্প ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে 'ঋগ্বেদে'। 'জাতকে'। 'রামায়ণে'। 'মহাভারতে'। 'পঞ্চতন্ত্রে'। আর গল্প আছে আরব্য-পারস্য উপন্যাসে।

কালিদাসের 'রঘুবংশম্'-কে তো একটা গল্প-ভাণ্ডারই বলা চলে। এছাড়া 'হিতোপদেশ',

'বেতালপঞ্চবিংশতি', 'কথাসরিৎসাগর', 'বৃহৎ-কথামঞ্জরী', 'দশকুমার চরিত', 'হর্ষচরিত', 'কাদম্বরী', 'বাসবদত্তা' প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে।

ভারতের 'কথাসরিৎসাগর' সমগ্র পৃথিবীকেই ব্যাপ্ত করেছিল। গল্পের আদিভূমি ভারতবর্ষ থেকেই গল্পের ধারা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমশ তা এক বিশ্ব-কথাসরিৎসাগরে পরিণত হয়।

আদি-গল্প : 'গোপীচাঁদের গীত', 'মনসার ভাসান', 'চণ্ডীমঙ্গল', 'শীতলা মঙ্গল', 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', 'ময়মনসিংহ গীতিকা' প্রভৃতি পাঁচালী বা গাথাগুলিকেও বাংলা সাহিত্যের আদি-গল্প রূপে ধরা যেতে পারে।

মানুষের নন্দন সাধনায় গল্প রচনা ও গল্পের বাসনা দিনে দিনে একাগ্র হয়েছে। আজও গল্প-সাহিত্যের জনপ্রিয়তা সবচেয়ে বেশি ও ব্যাপক। সভ্যতার শুরু থেকেই মানুষ এখনও গল্পের জাদুতে মুগ্ধ।

সেই কতকাল আগে কোন মহাজন কথাকে বৃহৎ করে লিখেছিলেন 'বৃহৎ-কথা'। আর কথা-সরিতের সাগর পাড়ি দিয়েছিলেন যিনি বা যাঁরা, তাঁরা তো আজ ইতিহাস। এগুলোই আমাদের বাংলা গল্পের প্রাচীনতম ঐতিহ্য। জন্তু-জানোয়ার-পক্ষীকেও যাঁরা নায়ক বা কথকের মর্যাদা দিয়ে গল্প শুনিয়ে গেছেন, সেই সাহসী আদি গল্পকারগণ আমাদের প্রণম্যজন। বহুকাল আগে 'পঞ্চতন্ত্র' আর 'হিতোপদেশ'-এও তো কম মহান গল্প শোনানো হয়নি। তারও পর কত-শত শতক পার হয়ে গেল চর্যা আর পদ্যের প্রবহমানতায়। সেই বয়ে চলা স্রোতোধারায় ক্রমশ একের পর এক এসে গেল গদ্য। গদ্য-সাহিত্য। আদি-গল্প। গল্প। ছোটগল্প।

(৩)

গদ্য : বাংলা গদ্যের সূচনা ও ক্রমবিকাশে সর্বপ্রথম ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বিশিষ্ট অবদানের কথা বলতেই হয়। তবে ইতিহাসের প্রেক্ষিতে এও উল্লেখ্য, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার (১৮০০) দুশো বছর আগেও বাঙালি সমাজে গদ্যরীতির প্রচলন ছিল।

ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, আবেদন-পত্র, মামলা-মোকদ্দমা বিষয়ক লেখাপত্র ও অন্যান্য দু'চারটি ছোটখাটো বাংলা গদ্যের নমুনা পাওয়া গেছে। যদিও সে-সব ছিল নিতান্তই কাজকর্মের ভাষা। বলাবাহুল্য, সেই কেজো গদ্যভাষা আদৌ শিল্পের ভাষা নয়। তা গদ্য মাত্র। গদ্যসাহিত্যও কখনই নয়।

দোম আন্তোনিও (আন্তোনিয়ো) দো রোজারিয়ো (রোজারিও) রচিত 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ' গ্রন্থটি ১৭২৬-এর পূর্বেই রচিত বলে অনুমিত হয়। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে ড. সুরেন্দ্রনাথ সেন 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ' শিরোনাম দিয়ে এটি প্রকাশ করেন। এটি নিছক একটি ধর্মপুস্তিকা।

১৭৩৫-এ রচিত হয় পর্তুগীজ পাদ্রী মানোএল (মানোয়েল)-দা-আস্‌সুম্পসাঁও-এর 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'। এটিও প্রশ্নোত্তর ঢঙে লেখা একটি ধর্ম-পুস্তিকা মাত্র।

এভাবে ক্রমশ বাংলা গদ্য পুঁথি থেকে মুদ্রণের যুগে আসতে থাকে। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই আগস্ট প্রতিষ্ঠিত হয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশে এই কলেজের অবদান বিস্ময়কর।

গদ্য-গ্রন্থ : ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত-মুনশীরাই প্রথম বাংলা গদ্যগ্রন্থ রচনা করেন। ইংলণ্ড থেকে নবাগত কিশোর ইংরেজ সিভিলিয়ানদের দেশীয় ভাষা ও ইতিহাস শেখাবার জন্যই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজটি স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু ক্রমে বাংলা গদ্য-সাহিত্যে এই কলেজের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

১৮০০ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ওয়েলেস্‌লির নেতৃত্বে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজটি স্থাপিত হয়। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে কেরী সাহেব এই কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ হন। বাংলা গদ্য-গ্রন্থের মুদ্রণ ও ক্রমবিকাশে এই বিদেশি মানুষটির অবদান প্রতিক্ষণ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য।

১৭৬১-র ১৭ই আগস্ট নরদামটনশায়ারের পলাস-পিউরি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন কেরী। ধার্মিক পিতার ধার্মিক পুত্র। ধর্মপ্রচারের জন্য সপরিবারে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই জুন। ১৭৯৩-এর ১১ই নভেম্বর কলকাতায় পৌঁছে ধর্মপ্রাণ ডাক্তার জন টমাসের বাংলার শিক্ষক রামরাম বসুকে কেরী তাঁর মুনশী নিযুক্ত করেন। সেদিন থেকেই মাসিক কুড়ি টাকা বেতনের বিনিময়ে কেরীকে বাংলা শেখাবার জন্য নিয়োজিত হন রামরাম বসু।

১৮০০ খ্রিস্টাব্দের ১২ই জানুয়ারি কেরী, ওয়ার্ড, মার্শম্যান প্রমুখ শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। এই কলেজ প্রতিষ্ঠার পর সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের ভার পান উইলিয়ম কেরী। সেই ভার গ্রহণের পর তিনি বিভাগীয় সুপরিচালনার অভিপ্রায়ে কয়েকজন পণ্ডিত-মুনশীর নিয়োগ সুপারিশ করেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রামরাম বসু। রামরাম এই কলেজে বাংলা ভাষার সহকারী অধ্যাপকরূপে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কাজ করেছিলেন। কেরী যাঁদের কাছে বাংলা ভাষা শিক্ষা লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রামরাম বসু (১৭৫৭-১৮১৩)।

উইলিয়ম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪) রচিত 'কথোপকথন' (১৮০১) এবং 'ইতিহাসমালা' (১৮১২) গ্রন্থ দুটির শেষোক্ত গ্রন্থটির মধ্যে ('ইতিহাসমালা') বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম গল্পরসের সন্ধান পাই। 'হিতোপদেশ', 'পঞ্চতন্ত্র' বা 'ইতিহাসমালা'-র গল্পগুলির উৎস লোককথা হতেও পারে। তবু এই আখ্যান বা গল্পগুলির মধ্যে কেরীর উর্বর কল্পনা, মৌলিক ভাবনা ও প্রতিভার স্ফুরণ ঘটেছে নিশ্চয়ই। 'ইতিহাসমালা'-য় কেরীর গল্পগুলি পড়লেই এ-কথার সত্যতা মিলবে। গল্পগুলি বেশ সুখপাঠ্য। কখনো-কখনো চমৎকার কৌতুকরস পরিবেশনে সবিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন কেরী। তাঁর রচনা ভঙ্গিমাও চিত্তাকর্ষক। সরল গল্প-আখ্যান পাঠককে আনন্দ দেয়।

বাংলা গদ্যরীতির সাধু প্রকরণটি যে ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠছিল, তা ১৮১২-তে

কেরীর রচিত 'ইতিহাসমালা' থেকেই বেশ টের পাওয়া যায়। এখানে কিছু কিছু গল্পে চমৎকার সরস রঙ্গ-কৌতুকের উদার প্রকাশ ঘটেছে। এজন্য কেরী, সেইকালের পরিপ্রেক্ষিত বিচার করে একালেও নিশ্চয়ই সকলের উচ্চপ্রশংসাই পাবেন।

কেরীর নির্দেশেই তাঁর পূর্বে অবশ্য দুটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন রামরাম বসু (১৭৫৭-১৮১৩)। 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১) এবং 'লিপিমালা' (১৮০২)। এ-কথা সত্য, 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' বাংলা অক্ষরে ছাপা বাঙালির রচিত প্রথম মুদ্রিত মৌলিক গদ্যগ্রন্থ। কিন্তু নীরস, তথ্যসর্বস্ব এই রচনায় গল্প-রসের কোনো অবকাশই ছিল না। তাছাড়া প্রথম মুদ্রিত গদ্য-গ্রন্থের রচনাকার হলেও গদ্য সৃষ্টির কৃতিত্ব তাঁর প্রাপ্য নয়।

সে কৃতিত্বের প্রধান দাবীদার সে-যুগের শ্রেষ্ঠ লেখক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (১৭৬২-১৮১৯)। ইনি লেখেন 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২), 'হিতোপদেশ' (১৮০৮), 'রাজাবলি' (১৮০৮) ও 'প্রবোধচন্দ্রিকা' (১৮১৩-তে রচিত, ১৮৩৩-এ মুদ্রিত)।

গদ্য-সাহিত্য : মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর কলমে ছিল বিশেষ প্রতিভার স্পর্শ। তাঁরই চেষ্টায় বাংলা গদ্য গদ্য-সাহিত্য হয়ে উঠেছে প্রথম। মৃত্যুঞ্জয়ই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক। বিদ্যাসাগরের পূর্বে তিনিই একমাত্র ভাষা-সচেতন শিল্পী। তাঁর রচিত 'প্রবোধচন্দ্রিকা'-র একাধিক আখ্যান উৎকৃষ্ট গল্প হয়ে উঠেছে। ভাষার মাধুর্যে, হাস্যরস সৃষ্টিতে, ব্যঙ্গ-কৌতুকের ছটায়, সর্বোপরি গল্প-রস পরিবেশনের কৃতিত্বে 'প্রবোধচন্দ্রিকা'-র একাধিক আখ্যান বা গল্প সে-যুগের পক্ষে এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। মৃত্যুঞ্জয়ের গদ্যেই প্রথম ভাষার প্রসন্নতা, স্বচ্ছন্দ প্রবাহ, সর্বোপরি গল্প-রস পাওয়া যায়।

রামমোহন রায়ের (১৭৭৪-১৮৩৩) রচনায় গল্প-রস ব্যাপারটা কল্পনাতেও আসে না। আসলে তিনি যুক্তির অস্ত্র ধারণ করে নানাবিধ সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সাহিত্য রচনার সময় তাঁর ছিল না। তাঁর ভাষায় তার্কিকতাই প্রধান। পরমত খণ্ডন ও নিজমত প্রতিষ্ঠার একমাত্র অভিপ্রায়ে তাঁর গদ্য হয়েছে শাণিত অস্ত্র। সাময়িক প্রয়োজনের জন্য লেখালিখি হওয়ায় সেখানে রম্য-সাহিত্য রস সৃষ্টির কোনো অবকাশই ছিল না। রামমোহন রায় ছিলেন প্রধানত যোদ্ধা। শিল্পী নন। তবে এ-কথা স্বীকার করতেই হয়, তাঁর গদ্যেই বাঙালির প্রথম মানসমুক্তি ঘটেছে। এটা ঐতিহাসিক সত্য।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৭৮৭-১৮৪৮) লেখালিখির প্রধান ও প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য ছিল সমাজের হিতসাধন। তবু তিনিই সর্বপ্রথম সাহিত্য রচনার মানসে আখ্যানধর্মী নকসা লেখেন। সেই রচনাগুলিতেও আমরা যথেষ্ট গল্পরসের সন্ধান পেয়েছি। সেগুলি হয়ে উঠেছে এক একটি সামাজিক গল্প।

যেমন অসংখ্য ছোট ছোট আখ্যানধর্মী সামাজিক গল্পের ফুল দিয়ে একটি অখণ্ড মালা গেঁথেছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩) তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ।

বিদ্যাসাগরের (১৮২০-১৮৯১) সকল কর্মেই প্রত্যক্ষ প্রেরণা জুগিয়েছে তাঁর গভীর সমাজসচেতনতা-বোধ। তাঁর গ্রন্থাবলী রচনার ক্ষেত্রেও এটা সমভাবে সত্য। ছোটদের জন্য লেখা তাঁর 'আখ্যানমঞ্জরী'-তেও এই সমাজ-সচেতনতার ছাপ সুস্পষ্ট।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের (১৮২৭-১৮৯৪) রচনাতেও আমরা পেয়েছি কাহিনীধর্মী গল্প-রস।

ছোটগল্পের পূর্বাভাস — গল্প : আধুনিক বাংলা ছোটগল্প একান্তই উনিশ শতকের দান। এই শতাব্দীর ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯১৯), স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২), নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৬১-১৯৪০) রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) সমসাময়িককালে গল্প লিখেছেন। তবে যথার্থ অর্থে আধুনিক ছোটগল্প বলতে যা বুঝি তা বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম এনেছেন রবীন্দ্রনাথই।

বাংলা সাহিত্যে প্রথম ছোটগল্পের কিছুটা লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে শ্রী পূঃ রচিত 'মধুমতী' গল্পে। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠমাসে (২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা) গল্পটি প্রকাশিত (১৮৭৩/১২৮০) হয়। ইনি ছিলেন বঙ্কিম-সহোদর শ্রী পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বলা বাহুল্য 'মধুমতী' যথার্থ অর্থে ছোটগল্প হয়ে ওঠেনি। 'বঙ্গদর্শন'-এ রচনাটিকে 'উপন্যাস' নামে পরিচিত করা হয়েছে। মূল গল্পাংশে বঙ্কিমের বিভিন্ন কাহিনীর প্রভাব অনায়াসে চোখে পড়ে। বিন্যাস ও ভাষাভঙ্গির ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য।

অবশ্য কারও কারও মতে বাংলা সাহিত্যে প্রথম ছোটগল্পের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৪-১৮৮৯) 'ভ্রমর' পত্রিকায় (১২৮১/১৮৭৪) প্রকাশিত 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' ও 'দামিনী' নামের গল্প দুটিতে। কিন্তু এ দুটিও ঠিক ছোটগল্প নয়। 'নভেল' শ্রেণির রচনা। এর মধ্যে অবশ্য 'দামিনী' গল্পটিতে ছোটগল্পের কিছুটা সম্ভাবনা ছিল। তবুও এগুলিকে ঠিক ছোটগল্প না বলে, ছোটগল্পের পূর্বাভাস বললেই যথার্থ বলা হয়।

ছোটগল্পের আবির্ভাব : বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের আবির্ভাব নিতান্ত আধুনিক-কালের ঘটনা। পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাস সন্ধান করলে অতিপ্রাচীনকাল থেকেই গল্প পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সচেতনভাবে 'ছোটগল্প' নামক একটি বিশিষ্ট রূপসৃষ্টি শুরু হয় উনবিংশ শতাব্দীতেই। তাই ছোটগল্প একেবারেই আধুনিক যুগের সন্তান। প্রাগাধুনিক যুগে আধুনিক ছোটগল্পের পূর্বপুরুষ সন্ধান নিষ্ফল প্রয়াস মাত্র। আসলে প্রশ্নমুখর আত্মানুসন্ধানী ব্যক্তিত্বের উদ্বোধন না হলে ছোটগল্পের জন্ম হতে পারে না। তাই, ছোটগল্পের জন্ম একেবারে আধুনিক যুগে। শিল্পবিপ্লবের পর। উনবিংশ শতাব্দীতে।

ছোটগল্পের জন্ম উনবিংশ শতাব্দীর এক ক্রম-অগ্রসরমান জীবনধারায়। ছোটগল্পের ইতিহাসগত সূচনা হল উত্তর আমেরিকায়, ওয়াশিংটন আরভিং-এর 'রিপভ্যান উইঙ্কল', এডগার অ্যালান পো-র 'ম্যানুসক্রিপ্ট বাউন্ড ইন এ বটল', আর নাথানিয়েল হথর্ন-এর 'সিলেশ্চিয়েস ওমনিবাস'-এ। তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল, ছোটগল্পের জন্ম পুরোনো পৃথিবীতে (ইউরোপে) হয়নি। হয়েছে নতুন পৃথিবীতে (আমেরিকায়)।

একসময় জীবনের পুরোনো মূল্যবোধগুলি পারিপার্শ্বিকের চাপে ধসে পড়ে।

স্বদেশি-কোম্পানি

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

ডমরুধরের প্রথম উপাখ্যানে চিত্রগুপ্ত, যম, যমনী, পুঁইশাক, এলোকেশী, এলোকেশীর মাতা প্রভৃতির বিষয় বর্ণিত হইয়াছিল। এলোকেশী ডমরুধরের তৃতীয় পক্ষের পত্নী। সেই উপাখ্যান পাঠের ফল এইরূপ,—

'ডমরুচরিত পড় রে ভাই ক'রে একান্ত ভক্তি।
ইহকালে পাবে সুখ পরকালে মুক্তি।।
চিত্রগুপ্তর গলায় দড়ি যমনী বাজায় শাঁক।
পুঁইশাকের নামে যমের সিঁটকে উঠলো নাক।।
ঝক মক করে সোনার গহনা এলোকেশীর গায়!
আড়নয়নে শাশুড়িঠাকরুণ পিটির পিটির চায়।।
পয়সা দিয়া ডমরুচরিত কিনে রাখে ঘরে।
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ পাবে ইহার বরে।।"

বর্তমান ডমরু উপখ্যানের ফলও সেইরূপ, বরং অধিক।

প্রতি বৎসর পূজার সময় ডমরুধর বন্ধুবান্ধবের সহিত নানারূপ গল্প করেন। পঞ্চমীর দিন বৈকালে তাঁহার পূজার দালানে লম্বোদর, গজানন, হলধর প্রভৃতি বন্ধুবান্ধবের সহিত প্রতিমার নিকট তিনি বসিয়া আছেন। ডমরুধরের মুখের দিকে চাহিয়া লম্বোদর বলিলেন, —'এবার পুনরায় স্বদেশী কোম্পানি খুলিয়া তুমি অনেকগুলি টাকা উপার্জন করিয়াছ।'

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—'হাঁ ভাই! স্বদেশি কোম্পানি বৃথা যায় না। কিছু না কিছু দিয়া যায়। কিন্তু ভাই, সম্প্রতি আমি এক ঘোর বিপদে পড়িয়াছিলাম। সে বিপদ হইতে মা দুর্গা আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। আমার প্রতি মায়ের অসীম কৃপা। বলিতে গেলে আমি মা দুর্গার বরপুত্র।'

লম্বোদর বলিলেন, —'সে-বার স্বদেশি কোম্পানি খুলিয়া তুমি আমাকে বাড়ি ভুঁড়ি গরীবদুঃখীর টাকা হজম করিয়াছিলে। একবার মোকদ্দমা হইয়াছিল জানি। কি হইয়াছিল বলো দেখি!'

ডমরুধর উত্তর করিলেন, —'মোকদ্দমা স্বদেশি কোম্পানির প্রধান অঙ্গ। স্বদেশি কোম্পানি খুলিলে সকলকেই মামলা-মোকদ্দমা করিতে হয়। যাহা হউক, এখন সব চুকিয়া গিয়াছে। এই নূতন স্বদেশি কোম্পানির বৃত্তান্ত এখন আমি তোমাদিগকে বলিতে পারি, শুন।'

ডমরুধর এইরূপ বলিতে লাগিলেন,—

গত বৎসর পূজার পর একদিন বেলা দশটার সময় আমি বাহিরে বসিয়া আছি, এমন সময় ব্যাগ হাতে করিয়া এক ছোকরা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার বয়স চব্বিশ কি পঁচিশ বৎসর। রং অল্প গৌরবর্ণ। কালো গোঁপ আছে। দেখিতে সুশ্রী। ভদ্র লোকের ছেলে বলিয়া বোধ হইল।

ব্যাগ হইতে চারিটি শিশি সে বাহির করিয়া বলিল, —'এইটি ম্যালারিয়া জ্বরের আরক, এইটি অজীর্ণ রোগের ঔষধ, এইটি বহুমূত্র রোগের ব্রহ্মাস্ত্র, আর এইটি মুখে মাখিলে রং ফরসা হয়। প্রতি শিশির মূল্য একটাকা আমাকে প্রদান করুন।'

আমি বলিলাম, —ঔষধে আমার প্রয়োজন নাই। তুমি বোকা লোকদিগের নিকট গমন করো। তোমার একটিও ঔষধ আমি ক্রয় করিব না।

আমার কথা শুনিয়া সে চলিয়া গেল না। অতি সুমিষ্ট স্বরে সে ঔষধের গুণ ব্যাখ্যা করিতে লাগিল। সে বলিল,—'আমি তিনটা পাশ দিয়াছি। যে বিদ্যা শিখিলে নানা পদার্থ মিশাইয়া উত্তম উত্তম বস্তু প্রস্তুত করিতে পারা যায়, আমি সেই বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছি। সেই বিদ্যাবলে আমি এইসব ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছি! ইহাদের গুণ অলৌকিক। দিন কয়েক ব্যবহার করিলেই আপনার শরীরে কান্তি ফুটিয়া পড়িবে আপনি নব-যৌবন প্রাপ্ত হইবেন।'

উত্তর করিলাম, —'আমার ম্যালেরিয়া জ্বর নাই, অজীর্ণ ও বহুমূত্র রোগ নাই। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, রং ফরসা হইবার সাধ নাই। তাহা ব্যতীত আমি বৃথা একটি পয়সাও খরচ করি না। তোমার ঔষধ আমি ক্রয় করিব না।'

আমাদের দুইজনে এইরূপ তর্কবিতর্ক হইতে লাগিল। কিন্তু সে ছোকরা নাছোড়বান্দা। এমনি সুমিষ্ট ভাষায় সে বক্তৃতা করিতে লাগিল যে, ক্রমে আমার মন ভিজিয়া আসিল। অবশেষে সে বলিল, —'আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন সত্য, কিন্তু মন আপনার বৃদ্ধ হয় নাই। মনটি আপনার নবযৌবনে ঢল ঢল করিতেছে। আর কোনো ঔষধ লউন আর নাই লউন, আপনাকে এই রং ফরসা হইবার ঔষধটি লইতে হইবে। দিনকতক মুখে মাখিয়া দেখুন। আপনি ফুট গৌরবর্ণ হইয়া পড়িবেন। সুন্দর সুকুমার কুড়ি বৎসরের যুবক হইবেন।'

ছেলেবেলা হইতে ফরসা হইবার আমার সাধ ছিল। অনেক সাবান মাখিয়াছিলাম। কিছুতে কিছু হয় নাই। মনে মনে ভাবিলাম, —'এই ঔষধটা পরীক্ষা করিয়া দেখি না কেন? যদি আমার রং ফরসা হয়, তাহা হইল দুর্লভী বাগদিনী আমার রূপ দেখিয়া মোহিত হইবে।'

শিশির মূল্য একটাকা কিন্তু সে আমাকে আট আনায় দিল। ঔষধ লইয়া সে কিছুদূর গিয়াছে' এমন সময় আমার মনে এইরূপ চিন্তার উদয় হইল। আমি ডমরুধর! সুমিষ্ট বক্তৃতা করিয়া আমাকে ঠকাইয়া এ আট আনা লইয়া গেল। এ সামান্য ছোকরা নয়। ইহা দ্বারা কি কোনোরূপ কাজ করিতে পারা যায় না?'

এইরূপ ভাবিয়া আমি তাহাকে ডাকিলাম। অদূর করিয়া আমার নিকট বসাইলাম। আমি বলিলাম, —'বাপু! তোমার নাম কি?'

সে উত্তর করিল, —'আমার নাম শংকর ঘোষ।'

তাহার বাড়ি কোথায়, সে কি কাজ করে, প্রভৃতি তাহার পরিচয় গ্রহণ করিলাম, —'তুমি তিনটা পাশ দিয়াছ। পাঁচ দ্রব্য মিশাইয়া নূতন বস্তু প্রস্তুত করিতে পারো। ঔষধ বেচিয়া কি হইবে? কোনো একটা লাভের বস্তু প্রস্তুত করিতে পারো না?'

কিছুক্ষণ নীরবে সে চিন্তা করিয়া আমাকে বলিল, —কল্য আসিয়া আপনার এ কথার উত্তর দিব।'

পরদিন সে ধবধবে চিক্কণ কাগজ আনিয়া আমাকে দেখাইল। সে বলিল—'এঁটেল মাটি হইতে আমি কাগজ প্রস্তুত করিয়াছি। এক টাকার এঁটেল মাটি হইতে দশ দশ টাকার কাগজ হইবে। নয় টাকা লাভ থাকিবে। প্রথম প্রথম যাহা অল্প খরচ হইবে, তাহা যদি আপনি প্রদান করেন তাহা হইলে আমরা এক স্বদেশি কোম্পানি খুলিব। লাভ অর্ধেক আপনার অর্ধেক আমার।'

এঁটেল মাটি ও কাগজ দেখিয়া আমি মনে মনে একটু হাসিলাম। স্বদেশি কোম্পানি সম্বন্ধে আমার একটু অভিজ্ঞতা আছে। ভাবিলাম যে এ কাজ হালাগুলো বাঙালির উপযুক্ত বটে। তাহার প্রস্তাবে আমি সম্মত হইলাম।

চারি পাঁচ দিন পরে আমরা দুইজনে কলিকাতা গমন করিলাম। ভালোরূপে একটা স্বদেশি কোম্পানি খুলিতে হইলে দুই-চারিজন বড়োলোকের নাম আবশ্যক। আমরা তাহার জোগাড় করিলাম। একটি মিটিং হইল। এঁটেল মাটি ও কাগজের নমুনা দেখিয়া বড়োলোকেরা ঘোরতর আশ্চর্য হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেবল একজন বলিলেন, —'এঁটেল মাটি দিয়া কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা আমি জানিতাম না। আমি মনে করিতাম যে, খড়িমাটি দিয়া কাগজ প্রস্তুত হয়।'

শংকর ঘোষ উত্তর করিলেন—'খড়িমাটি দিয়া হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে খরচ অধিক পড়ে।'

কাগজ সম্বন্ধে ইঁহার এইরূপ গভীর জ্ঞান দেখিয়া অন্য সকলে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

সেই যাঁহারা ইংরেজিতে বক্তৃতা করেন, যাঁহাদের বক্তৃতা শুনিয়া স্কুল-কলেজের ছোঁড়াগুলো আনন্দে হাততালি দিয়া গগন ফাটাইয়া দেয়, আমরা সেইরূপ দুইজন বক্তার জোগাড় করিয়াছিলাম। তাঁহারা ইজের দিয়া কোমর আঁটিয়া রাখেন। তাঁহাদের একজন বক্তৃতা করিলেন—

আমাদের কোম্পানির নাম হইল,—গ্র্যান্ড স্বদেশি কোম্পানি লিমিটেড।' কয়েকজন বড়োলোক ও উগ্র বক্তা ডাইরেক্টর বা পরিচালক হইলেন। কারণ, এই সকল বড়োলোক ও বক্তারা সকল প্রকার কাজকর্মে ও ব্যাবসাবাণিজ্য সম্বন্ধে ধুরন্ধর। ইঁহারা না জানেন, এমন বিষয় নাই। শংকর ঘোষ ইংরেজি ও বাংলায় কোম্পানির বিবরণ প্রদান করিয়া কাগজ ছাপাইলেন ও সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রচার করিলেন। বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল যে, ব্যক্তি একশত টাকার শেয়ার বা অংশ কিনিবে, প্রতিমাসে লাভস্বরূপ তাহাকে পঁচিশ টাকা প্রদান করা হইবে।

দেশে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। সকলে বলিতে লাগিল যে, আর আমাদের ভাবনা নাই। যখন এঁটেল মাটি হইতে কাগজ প্রস্তুত হইবে, তখন বালি হইতে কাপড় হইবে। বিদেশ হইতে কোনো দ্রব্য আর আমাদিগকে আমদানি করিতে হইবে না। দেশ টাকায় পূর্ণ হইয়া যাইবে। এই কথা বলিয়া কলিকাতায় বাঙালিরা একদিন সন্ধ্যাবেলা আপন আপন ঘর আলোকমালায় আলোকিত করিল।

প্রথম প্রথম শত শত লোক শেয়ার কিনিতে লাগিল। হুড় হুড় করিয়া টাকা আসিতে লাগিল। আমি কোষাধ্যক্ষ ছিলাম। টাকা সব আমার কাছে আসিতে লাগিল।

কয়েক মাস গত হইয়া গেল। এঁটেল মাটি দিয়া শংকর ঘোষ একখানিও কাগজ প্রস্তুত করিলেন না। মাসে যে পঁচিশ টাকা লাভ দিবার কথা ছিল, তাহার একটি পয়সাও কেহ পাইল না। আসল টাকার মুখও কেহ দেখিতে পাইল না। জনকয়েক আমাদের নামে নালিশ করিল। শংকর ঘোষ চমৎকার এক হিসাবের বহি প্রস্তুত করিয়া কাছারিতে দাখিল করিলেন। লাভ দূরে থাকুক, হিসাবে লোকসান প্রদর্শিত হইল। কোম্পানি 'লিমিটেড' ছিল। মোকদ্দমা ফাঁস হইয়া গেল। আমাদের কাহারও গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগিল না।

অনেকগুলি টাকা লোকে দিয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, সে টাকাগুলি সমুদয় আমি লইলাম। শংকর ঘোষ ভাগ চাহিল। আমি তাহাকে বুঝাইয়া বলিলাম,— 'হিসাবের বহি তুমি নিজে হাতে প্রস্তুত করিয়াছ। তাহাতে তুমি লিখিয়াছ যে, লোকসান হইয়াছে। কোম্পানি ফেল হইয়া গিয়াছে। টাকা আর কোথা হইতে আসিবে। বরং যাহা লোকসান হইয়াছে, তাহা আমাকে দিয়া যাও।'

আমার কথা শুনিয়া শঙ্কর ঘোষ ঘোরতর রাগান্বিত হইল। 'তুমি আমাকে ফাঁকি দিলে তোমাকে আমি দেখিয়া লইব,'—আমাকে এইরূপ ভয় দেখাইয়া সে চলিয়া গেল। আমার দ্বিতীয় কোম্পানির বৃত্তান্ত এই।

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন, —'তুমি বলিলে যে সম্প্রতি বড়ো বিপদে পড়িয়াছিলে। আমরা পাড়ায় থাকি। কোনো বিপদের কথা আমরা তো শুনি নাই।'

ডমরুধর উত্তর করিলেন, —'সে বিপদের কথা আজ পর্যন্ত আমি কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই। আজ তাহা তোমাদিগকে বলিতেছি শুন।'

লেখক পরিচিতি :

জন্ম : ১৮৪৭ ; পেশা : শিক্ষকতা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : কঙ্কাবতী, ভূত ও মানুষ, মজার গল্প, ডমরুচরিত ইত্যাদি। মৃত্যু : ১৯১৯।

গল্প-বিশ্লেষণ :

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের একজন অসাধারণ শক্তিমান লেখক হওয়া সত্ত্বেও তিনি এখন বিস্মৃত। নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের নামও সম্পূর্ণ বিস্মৃতির অতলে চলে গেছে। ত্রৈলোক্যনাথের নাম কিংবদন্তীর মতো শোনা যায়—বিশেষ করে তাঁর 'কঙ্কাবতী' গ্রন্থটির কথা। কিন্তু তাঁর অন্যান্য গ্রন্থরাজি প্রায় অপঠিত ও অচলিত। আশ্চর্য এই যে তাঁর মতো শিল্পীর সম্পর্কে বাংলা ভাষায় এক-আধখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থও রচিত হয়নি। অথচ ত্রৈলোক্যনাথ বাংলা সাহিত্যের একজন প্রধান শিল্পী।

উনবিংশ শতকের শেষ দশক থেকে বিংশ শতকের ষষ্ঠ দশক পর্যন্ত সময় সীমার মধ্যে বাংলা ছোটোগল্পের আকাশে অনেক তারা যেমন প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছে, তেমন অনেক তারা আবার নির্বাপিতও হয়ে গেছে। কিন্তু ব্যঙ্গ-কৌতুকের আকাশে উজ্জ্বল হয়ে শোভা পাচ্ছেন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। "It must be work of art first" এই মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার জন্যই ত্রৈলোক্যনাথের রচনা লাভ করেছে কালজয়ী সার্থকতা।